ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 387- 394
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.221

গোপভূমের ঐতিহ্যে আল্পনা গ্রাম লবন্ধার

রুদ্রনীল চোংদার, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, গুসকরা মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 28.10.2025; Accepted: 10.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The Dakshina Rarh Bengal was identified as 'Gopbhum' in ancient times. Dakshina Rarh region refers to Ajay in the north, Damodar in the south, Ganga in the east and Santal Pargana in the west. This region is identified as Gopbhum from the habitat of the Gop people. 'Gop' means one who raises cows/Goala. Since the cowherd cow breed has developed in the forested environment of the Ajay-Damodar Doab region, it has become known as 'Gopbhum'. This Gopbhum is rich in archaeological resources and historical monuments. Alpana village Labhandhar under Devshala Panchayat is located in this Gopbhum in district of Purba Bardhaman. Although the village is not very large in size, the entire village has mural paintings of various natural and unnatural subjects of various colors and several temples that are more than three hundred years old, deep forests filled with various trees and shrubs, and this village is home to various animals and birds. The entire village is like a canvas. Coming to such a different environment really fills the mind. Peacocks, sandalwood, partridges, Indian Wolf, hyenas and other species of animals and birds are often seen here. A private organization called Labhandar Annapurna Welfare Association (LAWA) is committed to protecting the village's heritage and jungle habitat.

Keywords: Rarhbhum, Gopbhum, Gopchandra, Mural Painting, LAWA, One story and Two-story Temple, Terracotta

'গোপভূম' বলতে বোঝায় প্রাচীনকালে দক্ষিণরাঢ় অঞ্চলকেই। মূলত দক্ষিণরাঢ় হল যার উত্তরে অজয় নদ, যা অজাবতী বা ঋজুপালিকা নদী নামেও পরিচিত। গ্রিক ভাষায় অজয় নদের নাম হল আমিস্টিস। দক্ষিনে দামোদর নদ, যা আদিবাসীদের কাছে দেও নদ নামে পরিচিত। তারা মৃতদেহের অস্থি বিসর্জন দিত দেওনদীর পবিত্র জলে। এই দামোদরের তীরেই নব্য প্রস্তর যুগের প্রত্নক্ষেত্র বীরভানপুর অবস্থিত।মোটকথা বর্ধমান জেলার অজয়-দামোদর নদের মধ্যবর্তী বেশ কিছু অংশকেই বলা হয় 'গোপভূম'। পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার কিছু অংশ জুড়ে বিস্তৃত। দ্বিগবিজয় প্রকাশ গ্রন্থে বলা হয়েছে,

'অজয়াদ্দক্ষিণে ভাবে শিলাবত্যাশ্চ হুত্তুরে
গঙ্গায়া: পশ্চিমে পারে দারিকোশহি পূর্ববত:'

অর্থাৎ দক্ষিণে অজয় উত্তরে শিলাবতী পশ্চিমে গঙ্গা আর পূর্বে দ্বারকা নদীই হলো গোপভূমের সীমানা।[১] সাধারণত বলা যায় মল্ল রাজাদের (বাঁকুড়া, পুরুলিয়া) বাসভূমি থেকে 'মল্লভূম', সেন রাজাদের বাসভূমি থেকে 'সেনভূম', আর বীর জাতির বাসভূমি থেকে 'বীরভূম' যদি হয়। তাহলে গোপ জাতির বাসভূমি থেকে 'গোপভূম' এভাবে ব্যাখ্যা করা

যেতে পারে। বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়- 'গো' শব্দের অর্থ গরু আর তাদের প্রতিপালন করে যে সম্প্রদায় তাদের 'গোপ' অভিধায় ভূষিত করা হয় এবং তাদের বাসস্থান স্বাভাবিক ভাবেই পরিচিত হয় 'গোপভূম' নামে।[২] বিহারের আদিবাসীদের দেওয়া 'দা-মুন্ডা'/ 'Dah Mondah' (মুন্ডাদের জল) শব্দ থেকে দামোদর কথাটি এসেছে। দামোদরের মোট দৈর্ঘ্য ৫৯২ কি.মি, এর মধ্যে ৩১০ কি.মি পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বিহারের পালামৌ জেলার ছোটনাগপুর পাহাড়ের চান্দওয়া গ্রামের কাছে উৎপন্ন হয়ে দামোদর পুরুলিয়া-পাঞ্চেত অতিক্রম করে বর্ধমানে প্রবেশ করেছে, অনেকবার গতি পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে দামোদর নদী হুগলি ও হাওড়া জেলায় ঢুকে হাওড়ার গড়ুরমুক হয়ে শিবগঞ্জ গ্রামের কাছে হুগলি নদীতে মিশেছে। দামোদরের তিনটি উল্লেখযোগ্য খাত হল- বাঁকা, খড়ি ও বেহুলা।[৩] বর্ধমান ও বীরভূম জেলার সীমা নির্দেশকারী অজয় নদের দক্ষিণ তটভূমিতে অবস্থিত পান্ডবেশ্বর, নবগ্রাম, মঙ্গলকোট, কেন্দুলী, কাটোয়া প্রভৃতি জন-এলাকার মধ্য দিয়ে প্রভাবিত হয়েছে। অজয় উৎপত্তি বিহারের জামুই জেলায়। এরপর অজয় নদ ঝাড়খন্ড হয়ে পশ্চিম বর্ধমানের চিত্তরঞ্জনের নিকট প্রবাহিত হয়ে নতুনহাটে আরেক নদী কুনুর নদীর সাথে মিলে কাটোয়ায় ভাগীরথীর সঙ্গে মিশেছে।

অতি প্রাচীনকালে অজয়-দামোদরের দোয়াব অঞ্চলের অরণ্য ঘেরা পরিবেশে গোপালক গোপ জাতির বসবাস গড়ে ওঠায় তা 'গোপভূম' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। প্রত্নসম্পদ ও ঐতিহাসিক নিদর্শনে সমৃদ্ধ এই গোপভূম। এই এলাকায় রয়েছে পান্ডু রাজার ঢিবি, ভরতপুর বৌদ্ধস্তূপ, ইছায় ঘোষের মন্দির, গড় জঙ্গলের মহিষমর্দিনী, কালিকাপুর রাজবাড়ী, বন নবগ্রাম রাজবাড়ি, লবন্ধার আলপনা গ্রাম, অমরাগড়ের মন্দিরসমূহ, দিগনগরের জল টুঙ্গী, অরণ্য সুন্দরী ভালকি-মাচান এবং মন্দিরময় মৌখীরা গ্রাম, দেবী মঙ্গলচন্ডী থান, বৈষ্ণব কবি লোচন দাসের সমাধি, কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের বাসগৃহ, হোসেন শাহী মসজিদ,বিক্রমাদিত্যের ঢিপি, দানেশ মন্দ খাঁয়ের সমাধি প্রভৃতি। নব্য প্রস্তর ও তাম্র প্রস্তর যুগের বিভিন্ন নিদর্শন মিলেছে এই অঞ্চলে। উদাহরণ- নডিহা, বীরভানপুর, মঙ্গলকোট, পাণ্ডুক ইত্যাদি।

খ্রিষ্টিয় ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্য দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে আঞ্চলিক শক্তির অভ্যুত্থানের সময় জমিদার শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। এই সময় রাঢ় অঞ্চলে প্রভাবশালী জমিদার গোপচন্দ্র নিজেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম শাসক হিসেবে ঘোষণা করেন। তখন স্থানীয় জমিদার হয়ে ওঠেন স্থানীয় রাজা। প্রসঙ্গত বলা যায় দুই বর্ধমান জেলা হলো রাঢ়র মূল কেন্দ্র এবং প্রাচীন গোপভূমিরই অংশ।[৪] মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্র ছিলেন গোপভুমেরই স্বাধীন নৃপতি। একাদশ শতকে ঈশ্বর ঘোষ বা ইছাই ঘোষ নামে আর এক গোপরাজার সন্ধান পাওয়া যায়। তার রাজধানী ছিল গড়-জঙ্গল। ইছাই ঘোষের সময়েই গোপভূমিতে গোপ ও সদগোপ সম্প্রদায়ের আধিপত্য আরো সুদৃঢ় হয়। ইছাই ঘোষের পর গোপভূমিতে রাজত্ব করেন মহেন্দ্রনাথ। লোকমুখে তিনি 'মাহিন্দী রাজা' নামে খ্যাত ছিলেন।[৫] তাঁর রাজধানী ছিল ভালকি-মাচান। তিনি অমরাগড়কে (মানকরের কাছে) কেন্দ্র করে রাজ্য শাসন পরিচালনা করতেন।

সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলায় মুঘল শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলায় গোপ রাজত্বের অবসান ঘটে। বর্ধমান রাজবংশের আদি পুরুষ সঙ্গম রায়ের পুত্র আবু রায় ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের তিনটি স্থানের কোতোয়ালি লাভ করেন। পরে আবু রায়ের পুত্র বাবু রায় আরো তিনটি মৌজার সত্ত্ব লাভ করেন বার্ষিক তিন লক্ষ টাকার বিনিময়ে। এভাবে অষ্টাদশ শতকে চিত্রসেন ও ত্রিলোকচাঁদের আমলে বর্ধমান রাজাদের ভূ-সম্পত্তির এলাকা এবং তাদের রাজত্বের সীমানা বহু দূর বিস্তৃত হয়। যার মধ্যে গোপরাজাদের স্মৃতি বিজড়িত অমরাগড় বা ভালকি এবং কাঁকসাও ছিল। এই গোপভূমেই অবস্থিত ক্যানভাস তথা আলপনা গ্রাম লবন্ধার। গুসকরা থেকে এই গ্রামের দূরত্ব ৩০ কি.মি এবং মানকর রেলস্টেশন থেকে দূরত্ব ১২ কি.মি। আর দুর্গাপুর থেকে ৩২ কি.মি।

পূর্ব বর্ধমানের লবন্ধার গ্রাম:

আউসগ্রাম ব্লকে অবস্থিত লবন্ধার নামক গ্রামটি। এটি ঐতিহ্যের দিক থেকে অনেক প্রাচীন হলেও বর্তমানে জনপ্রিয়তার কারণ হল গোটা গ্রামই যেন ক্যানভাস তথা রঙিন ছবির গ্রাম। এর বিশেষত্ব হল Mural Painting. আউসগ্রাম হল পশ্চিমবঙ্গের একটি বিধানসভা কেন্দ্র (২৭৩)। এই আউসগ্রাম ব্লকটি ১ নং এবং ২ নং- দুটি ব্লকে বিভক্ত। আউসগ্রাম ১ এর আয়তন হল ২২২.৩৪ বর্গ কিলোমিটার। এই ব্লকের মধ্যে রয়েছে গুসকরা, আউসগ্রাম,বন নবগ্রাম, দীঘনগর, ভোঁতা প্রভৃতি। আউসগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের আয়তন হল ৩৬০.৪৫ বর্গ কিলোমিটার। এর অন্তর্গত

জায়গাগুলি হল- অমরা গড়, দেবশালা, জিজিরা, মোরবাঁধ, এরাল, সর, ভেদিয়া প্রভৃতি। লবন্ধার গ্রামটি দেবশালা পঞ্চায়েত এবং বড়ডোবা মৌজার (২১৬) অন্তর্গত এবং জে এল নং হল ৮০৬. গ্রামের আয়তন খুব বেশি নয়, মাত্র ৮০০-৯০০ মানুষের বাস এবং প্রায় ১৫০ টি পরিবার বর্তমান। গ্রামের মূল আয়ের উৎস হল জঙ্গল। মানুষের মূল জীবিকা হল কৃষি, এছাড়া রয়েছে বিড়ি শিল্প, শালপাতা শিল্প, ঝাঁটা তৈরি, মাটির জিনিস তৈরি ইত্যাদি।

পূর্ব বর্ধমান জেলার 'আলপনা গ্রাম লবন্ধার'। আলপনা গ্রাম বলতে আমরা ঝাড়গ্রাম জেলার খোয়াব গাঁয়ের নাম শুনেছি। তবে আমাদের পূর্ব বর্ধমান জেলার ভেতর যে একটি আলপনা গ্রাম আছে, তা আমাদের মত অনেকেরই অজানা ছিল। আলপনার গ্রাম লবন্ধার হল যুগ যুগ ধরে আদিবাসী মেয়েদের মধ্যে রয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ও ঘর-গেরস্থালি সাজিয়ে তোলার একটা পরম্পরা। লবন্ধার গ্রাম যেন সেই পরম্পরাকেই নতুন করে চিনিয়ে দিয়েছে। গ্রামের প্রায়শই বাড়িগুলির গায়ে আঁকা অপূর্ব সব ছবি। পথের ধারেও নজর কাড়বে দেওয়াল জুড়ে ছবির ক্যানভাস। সেইসব বুকে করেই এখন লবন্ধার হয়ে উঠছে আকর্ষণের নয়া কেন্দ্রবিন্দু।

লবন্ধার গ্রামের উৎপত্তি নিয়ে তেমন কোন নির্ভরযোগ্য উপাদান পাওয়া যায়না, যা পাওয়া যায় তা হল জনশ্রুতি এবং স্মৃতিচর্চা (Memory Studies)- এই দুটি বিষয়ের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করতে হয়। গ্রামবাসীদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বলা যায়, প্রায় তিনশত বছর আগে জীবন বা জেবনা ডাকাত বড়ডোবা অঞ্চলে ঘাঁটি গেঁড়েছিল। কিন্তু সে বুদবুদ এলাকায় চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েন এবং তাঁর পূজিত দেবী কালী ঠাকুরকে কেন্দ্র করে লবন্ধার গ্রামে প্রতিবছর মাঘী অমাবস্যায় ডাকাত কালীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। পৌষ সংক্রান্তিতে LAWA-র উদ্যোগে ইদানিং প্রত্যেক বছর মাটির তৈরি পুতুলের কর্মশালা আয়োজিত হয়। সেখানে গ্রামের মহিলারা মাটির পুতুলের সাথে সাথে কালীমূর্তি ও তৈরি করে থাকেন। এই ডাকাত কালীকে নিয়ে প্রত্যেক গ্রামবাসীর অনেক বিশ্বাস ও অলৌকিক কাহিনী জড়িয়ে আছে।

যাইহোক, ডাকাতের উৎপাত থেকে বাঁচতে বড়ডোবায় রায় পরিবার একটি পাখিকে ওড়ায় এবং তারা ঠিক করে পাখিটি যেখানেই বসবে সেখানেই নতুন বসতি স্থাপন করা হবে। তখন পাখিটি লবণধার গ্রামের ধর্মরাজ তলায় একটি বড় বটগাছে এসে বসে। সেখানে পরবর্তীতে বন কেটে বসতি স্থাপন করে গ্রামের নাম রাখা হয় নতুনগ্রাম। কিন্তু এই নামে আগেই অনেক গ্রামের নাম থাকায় বিভ্রান্তি এড়াতে পুকুরের পার্শ্ববর্তী থাকায় নাম রাখা হয় 'নবাধার', যা ক্রমে 'লবনধার' নামেই পরিচিত হয়ে ওঠে।[৬] প্রতিবেশী গ্রামগুলি আবার গ্রামের ভাষায় বলে 'লন্ধে' বা 'নন্ধে' গ্রাম। তবে বর্তমানে গ্রামটি আল্পনা গ্রাম বা art village হিসাবেই খ্যাতি পেয়েছে। তবে এই নাম কে বা কারা দিয়েছে- তাও অজানা গ্রামবাসীদের। সুপ্রাচীন এই গ্রামের চারিপাশ ঘন-জঙ্গল দিয়ে ঘেরা শাল, সেগুন, শিশু, মহুয়া, পলাশ, পিয়াল ও শিমুলের গভীর অরণ্যের চক্রব্যূহ ভেদ করে প্রায় তিন থেকে চার কি.মি ছায়া শীতল ও পল্লী বৈচিত্র্যের পথ পেরিয়ে তবেই নাগাল পাওয়া যায়। লবণধার গ্রামের নামকরণের পিছনে নানা মতানৈক্য থাকলেও প্রকৃতিকে রক্ষা করতে সকলেই বদ্ধপরিকর।

গ্রামের মানুষের প্রধান জীবিকা হল কৃষি এবং ধানই হল প্রধান ফসল। এছাড়া গম, সর্ষে, আলু ও তিল চাষ হয়। জমিতে সেচের ব্যবস্থা থাকলেও শীতের মরসুমে জল না মেলায় সারা বছর চাষের কাজ করতে পারেন না গ্রামবাসীরা। পশুপালনও তাঁরা করে থাকেন। তবে গ্রামের আয়ের অন্যতম উৎস আসে জঙ্গল থেকে। শুকনো গাছের ডালপালা জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত হয় প্রতিটি পরিবারেই মাটির উনুন দেখা যায়। তাছাড়া দশকর্মার দ্রব্য (প্রধানত ত্রিফলা- আমলা, হরিতকি ও বয়রা) এগুলি জঙ্গল থেকেই শহর অঞ্চলে যায় এবং এখানকার অধিবাসীরা বিড়ি, শাল পাতা, কুচির ঝাঁটা, খেজুর পাতার ঝাঁটা প্রভৃতি প্রস্তুত করে সেগুলিকে বাজারজাত করে জীবিকা নির্বাহ করেন। অধ্যাপক অর্ণব ঘোষের কথায়, গ্রামের বাসিন্দাদের জীবনে জঙ্গলের অবদান অনস্বীকার্য। জঙ্গল থেকে শালপাতা, কেন্দু পাতা (বিড়ি তৈরির পাতা) সংগ্রহ করে মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। সর্বোপরি পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার ক্ষেত্রে জঙ্গলের অবদানকে অস্বীকার করা যাবে না। এসব কথা মাথায় রেখে ২০২১ থেকে LAWA- র উদ্যোগে প্রতি বছর জঙ্গল বাঁচানোর অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়, যার tagline টি হল- *'বিশ্বকে বাঁচাতে অরণ্য থাকুক মাথাতে'।* বর্তমানে সামাজিক মাধ্যমের দরুণ পরিচিত কিছুটা হলেও বেড়েছে। বলা দরকার, বেশ কিছুদিনে আগে আউশগ্রাম জঙ্গল এলাকায় আগুন ধরানো নিয়ে বেশ কিছু প্রতিবেদন বেড়িয়েছিল। মূলত মানকর কলেজের অধ্যাপক ড.প্রবীর

কুমার পাল, অর্ণব ঘোষ এবং খ্যাতনামা সাহিত্যিক রাধামাধব মন্ডল প্রমুখ সহৃদয় ব্যক্তিরা এগিয়ে এসেছেন এবং তাঁদের সহযোগিতায় পরিস্থিতি কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

যুগ ধরে আদিবাসী মেয়েদের মধ্যে রয়ে গেছে ঘর গেরস্থালি সাজিয়ে তোলার একটা পরম্পরা। লবন্ধার যেন সেই পরম্পরাকেই নতুন করে চিনিয়ে দেয়। গ্রামের সমস্ত বাড়িঘরের গায়ে আঁকা অপূর্ব সব ছবি। পথের ধারেও নজর কাড়বে দেওয়ালে দেওয়ালে ছবির ক্যানভাস। সেইসব বুকে করেই এখন লবন্ধার হয়ে উঠছে আকর্ষণের নয়া কেন্দ্রবিন্দু। দূর দূর থেকেও মানুষ আসছেন এই আদিবাসী গ্রাম দেখতে। বরাবরই এ গ্রামের আদিবাসী মেয়ে-বউরা তাঁদের ঘরের আকর্ষণ বাড়াতে ছবি আঁকতেন দেওয়ালে। গ্রামের পথে হাঁটলেই সেই সব মন ভোলানো ছবি হাঁটার গতি কমিয়ে দিত। শুধু আদিবাসীরা নয় এই গ্রামের বাকি অধিবাসীরা এই ঐতিহ্যকে বজায় রেখেছেন। সম্প্রতি LAWA-র উদ্যোগে বিশ্বভারতী থেকে পেশাদার শিল্পীরা এসে পরের পর ছবি এঁকেছেন এই গ্রামের দেওয়ালে দেওয়ালে। অপূর্ব সেই সব সৃষ্টি আলাদা পরিচয় দিয়েছে এই গ্রামের। এদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী নন্দ দুলাল মুখোপাধ্যায়, সুতানু চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। তবে গ্রামের মানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হল যে এখানে ২০২৪ সালের, অক্টোবরে 'জুলোজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া'-র (ZSI) উদ্যোগে 'বনশ্রী প্রকল্প' আয়োজিত হয়েছে। যেখানে পরিবেশের পাশাপাশি পশু পাখির সুরক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। যার প্রধান ছিলেন Dr. Rajmohana K (Scientist, ZSI & Coordinator, EIACP, ZSI, Kolkata). এছাড়াও গ্রুপে ছিলেন Dr. Kaushik Deuti (Scientist, ZSI), Mr Subhendu Biswas (Sr. Artist, ZSI) এবং Dr.Tridip Kumar Datta (Prg. Officer, EIACP, ZSI, Kolkata). তাছাড়া, কলকাতা, কল্যাণী, রবীন্দ্র ভারতী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও অধ্যাপক ও ছাত্র ছাত্রীরা গ্রামে এসেছেন এবং বিভিন্ন কর্মশালায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণও করেছেন।

এযাবৎ LAWA এর উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালা গুলি হল- 'বসে আঁকো প্রতিযোগিতা-জীবনধারায় অরণ্য ২০২৫', 'ওডিসি নৃত্য কর্মশালা', 'দেওয়াল চিত্র অঙ্কন কর্মশালা', 'মাটির পুতুল নির্মাণ কর্মশালা' প্রভৃতি। প্রতিবছর চৈত্র মাসে বাসন্তী পূজার সময় এখানে দেবী অন্নপূর্ণার পূজোও অনুষ্ঠিত হয়। দেবী অন্নপূর্ণাই গ্রামের প্রধান দেবী এবং গ্রামের মানুষের মূল উৎসব। দীর্ঘ ২৫০-৩০০ বছর ধরে এই পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তবে মন্দিরটি বর্তমানে নতুনভাবে সংস্কার করে দেওয়াল চিত্র দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে, যা এই গ্রামের মূল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। এই পূজা উপলক্ষ্যে গ্রামে মেলা, যাত্রাপালা, কবিগান ও গ্রামের মানুষদের নিয়ে বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়ে থাকে। মূলত এইসমস্ত লুপ্তপ্রায় গ্রাম্য অনুষ্ঠান বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা। যার জন্য এই লবন্ধার গ্রামের মানুষদের কুর্নিশ জানাতেই হয়। উল্লেখ্য প্রতিবছর বুদ্ধ পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত ধর্ম রাজের গাজনও মহা সমারোহে পালিত হয়।

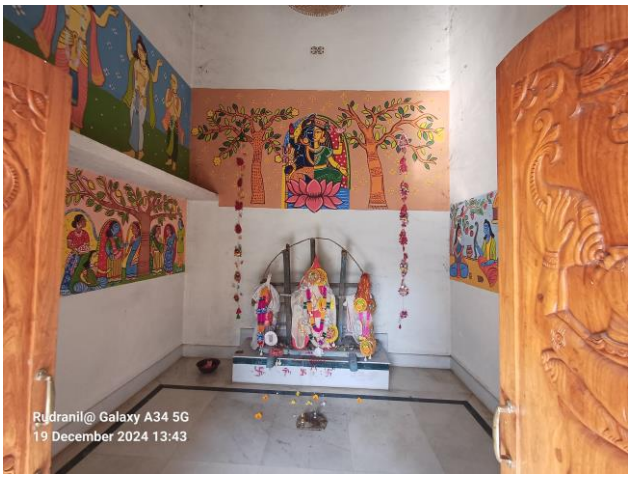

গ্রামের অন্নপূর্ণা মন্দির, চিত্র নিজস্ব

লবন্ধার গ্রামে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পশু পক্ষীর বিচিত্র সম্ভার লক্ষ্য করা যায়। ভিন্ন মরসুমে পরিযায়ী পাখিদের দেখা মেলে। সাধারণত যে সমস্ত পাখিদের দেখা যায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- Plum Headed Parakeet (লাল মাথা টিয়া), Ashy Prinia (কালচে প্রিনা), Common Snip (কাদা খোঁচা), Indian Nightjar (রাত চরা), Indian Peafowl (ময়ূর), red naped Ibis (কালো কাস্তেচরা), Grey Bellied Cukoo (ধূসর কোকিল), Common Wood shrike (কসাই পাখি), Large Cukoo Shrike, Ashy Wood Swallow (ধূসর আবাবিল), Long Tailed Shrike (লম্বা লেজের কসাই পাখি) প্রভৃতি। এছাড়াও আছে বাবুই, ফিঙে, সাদা পেঁচা, দোয়েল, টিয়া, ময়না ইত্যাদি। অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে আছে- হায়না, শিয়াল, ভাম, খটাস, বিভিন্ন প্রজাতির সাপ, ব্যাঙ প্রভৃতি। শাল, পিয়াল, বরুণ, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, বট, মহুয়া বিভিন্ন বিচিত্র গাছ পরিবেশকে ছবির মত সাজিয়ে তুলেছে।

ভারত, মিশর, গ্রিস সহ অন্যান্য দেশে প্রাচীন সভ্যতার সময়কাল থেকেই শোনা যায় ভেষজ বা প্রাকৃতিক রঙ এর ব্যবহারের কথা। প্রথম কৃত্রিম রং ব্যবহার করা হয়েছিল ইংরেজির ১৮৫৭ সালে। প্রাকৃতিক রং সংগ্রহ করার উৎস হল ৩টি- বিভিন্ন গাছের ফুল-ফল, খনিজ পদার্থ ও পোকামাকড়। মূলত লবন্ধার গ্রামে প্রায় বাড়িগুলির

দেওয়ালে যে আল্পনার রং ব্যবহৃত হয়েছে তার বেশিরভাগই প্রাকৃতিক উপায়ে প্রস্তুত এবং কৃত্রিম রং কমই ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্বভারতীর কলা ভবনের ছাত্র ছাত্রীরা এবং এই গ্রামের সোমা, পূর্ণিমা, রেখার মত বালিকারা দেওয়ালে আল্পনা আঁকতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে। তাদেরই প্রচেষ্টার ফলে গ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্য আবার ফিরে এসেছে। দেওয়াল আল্পনায় দেখা যায় বনবিবি, শিব, জগন্নাথ-বলরাম-শুভদ্রা, রাধা-কৃষ্ণ, মা দুর্গা ও বিভিন্ন প্রকার পশু-পক্ষী ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী।

১৭৫১ শকাব্দ অর্থাৎ ইংরাজির ১৮২৯ সাল সময়ে লবন্ধারের অধিবাসী ছিলেন সম্ভ্রান্ত বিত্তশালী রায় পরিবার। সেই সময়ে রায় পরিবারের বড় ছেলে গদাধর রায় তাঁর চার ভাইয়ের নামে নির্মাণ করেন চারটি শিব মন্দির ও একটি বিষ্ণু মন্দির। যদিও গদাধর রায়ের নির্মাণ করার কথা ছিল পাঁচটি শিব মন্দির। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে তাঁদের একমাত্র বোনের অকাল মৃত্যুর জন্য সেই মন্দিরের নির্মাণ করা যায়নি, সেই জায়গা আজকের দিনেও ফাঁকা রয়ে গেছে। কালের নিয়মে ও সংস্কারের অভাবে মন্দির গুলোর আজকে জরাজীর্ণ অবস্থা। মূল রাস্তা থেকে একটি ভগ্নপ্রায় দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে হয় মন্দির প্রাঙ্গনে। প্রবেশের পরেই ডানদিকে দেখা যায় ত্রিখিলান প্রবেশ পথ যুক্ত দালান মন্দির আকৃতির বিষ্ণু মন্দির। এখানে শালগ্রাম শিলা নিত্য পূজিত হয়। নারায়ণ মন্দিরের তেমন উল্লেখযোগ্য অলংকরণ না থাকলেও খিলানের ওপরে রয়েছে দু একটি পঙ্খের নকশা। নারায়ণ মন্দির থেকে একটু এগিয়ে গেলেই দেখা যাবে পরপর চারটি শিব মন্দির রয়েছে। মন্দির গুলো কালের নিয়মে শোচনীয় হলেও এখানে রয়েছে বেশ কিছু টেরাকোটা অলংকরণ। শিব মন্দির চারটির কিছু গঠন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। মন্দির গুলো চারটে একই আকারের তো নয় এক গঠনশৈলীরও নয়। এখানে চার ভাইয়ের নামে মন্দির গুলো নির্মাণ করা হয়েছে, বামদিক থেকে গোলকেশ্বর, গদাধর, মনিদাক্ষ ও অকুড়েশ্বর। এখানে কেবল মাত্র গদাধর মন্দিরটি দেউল আকৃতির ও অন্যান্য মন্দির তিনটি আটচালা শৈলীতে নির্মিত হয়েছে। মন্দির গুলো পূর্বমুখী। সাধারণ ভাবে মন্দিরের গাত্রে প্রতিষ্ঠা লিপি থাকে কিন্তু এখানে গদাধর মন্দিরের পাদদেশের পাশে রয়েছে ফলক তার থেকেই জানা যায় মন্দিরটি ১৭৫১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮২৯ সালে নির্মাণ করা হয়েছে। হিসাব করলে দেখা যাচ্ছে আজকের হিসাবে মন্দিরের বয়স

১৯৪ বছর। মন্দির গুলোতে রয়েছে কিছু টেরাকোটা অলংকরণ। ফলক গুলোর মধ্যে দশঅবতার, নানান পৌরাণিক কাহিনী, দেব দেবীদের মূর্তি যেমন রয়েছে তেমনি বাজনা বাজানরত বাদকের চিত্র ও তুলে ধরা হয়েছে এখানে। একটি ফলকে দেখা যাচ্ছে শিশু গনেশ কে কোলে বসিয়ে রেখেছেন মা পার্বতী। অকুলেশ্বর মন্দিরের খিলানের ওপর টেরাকোটা ফলক গুলো দেখে মনে হয় সেই ফলক গুলো সম্ভবত পরবর্তীকালে স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি মন্দিরে রয়েছে কালো কষ্টি পাথরের শিব লিঙ্গ। মন্দিরে নিত্য পূজা করা হয়। মন্দির গুলোর আশু সংস্কার প্রয়োজন। যদিও টেরাকোটা মন্দির যথাযথ সংস্কার করতে লাগবে বিপুল অর্থবল।[৭]

পাদটীকা:

১) **রাঢ়ভূম**: ভাষাবিদ প্রভাত রঞ্জন সরকারের মতে ‘রাঢ়’ শব্দটির উৎস প্রোটো-অস্ট্রোএশিয়াটিক ‘রাঢ়’ বা ‘রাঢ়ো’ শব্দ দুটি থেকে, যার অর্থ লাল মাটির দেশ বা ল্যাটারাইট মৃত্তিকার দেশ। যাইহোক রাঢ় বাংলার অন্তর্ভূক্ত অঞ্চলগুলি হল সম্পূর্ন বীরভূম জেলা, বর্ধমান জেলার মধ্যভাগ, বাঁকুড়া জেলার পূর্ব ও দঃ পূর্ব ভাগ ও পশ্চিম মেদনীপুর জেলার পশ্চিমভাগ রাঢ়ের অন্তর্গত। এছাড়া প্রেসিডেন্সি বিভাগের মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার অংশ বিশেষ এবং হুগলি ও হাওড়া জেলার সামান্য অংশ রাঢ়ের অন্তর্গত।

২) **গোপভূম**: অতি প্রাচীনকালে অজয়-দামোদর নদের দোয়াব অঞ্চলের অরণ্যঘেরা পরিবেশে গো-পালক গোপ জাতির বসবাস গড়ে ওঠায় তা ক্রমে ‘গোপভূম’ নামেই পরিচিত হয়ে ওঠে। এর সীমানা পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার কিছু অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত।

৩) **গোপচন্দ্র**: স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যের সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম গুরুত্বপূর্ণ শাসক ছিলেন ‘গোপচন্দ্র’। খ্রিষ্টিয় ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হয়ে যাওয়ার সুযোগে পূর্ব এবং দক্ষিণ বাংলা এবং পশ্চিম বাংলার দক্ষিণ অংশে তিনি স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া থেকে আবিষ্কৃত ৫টি তাম্রশাসন, বর্ধমান জেলার মল্লসারুলে প্রাপ্ত ১টি এবং ওড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার জয়রামপুরে প্রাপ্ত অপর ১টি তাম্রশাসন থেকে স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যের তিনজন শাসকের নাম জানা যায়। এঁরা হলেন গোপচন্দ্র,

ধর্মাদিত্য, সমাচারদেব। সম্ভবত তিনি গুপ্ত সম্রাট বৈন্য গুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন।গোপচন্দ্র 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করেছিলেন বলে মনে করা হয়।

৪)**Mural Painting**: এর বাংলা অর্থ দেওয়াল চিত্র। মুর্য়াল হল একটি স্পেনীয় শব্দ, যার অর্থ হল প্রাচীর। ভারতে এই চিত্রের সূচনা হয় মুঘল আমলে। বর্তমান গ্রাম বাংলায় আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় দেওয়ালের উপরে বিভিন্ন রঙীন চিত্র অঙ্কন করা আছে।

৫) **লবন্ধার অন্নপূর্ণা ওয়েলফেয়ার আসোসিয়েশন (LAWA)**: এটি একটি স্বেচ্ছা সেবক সংস্থা। বর্তমানে এর কর্ণধার মানকর কলেজের শারীর শিক্ষা বিষয়ক অধ্যাপক অর্ণব ঘোষ। মূলত লবন্ধার অন্নপূর্ণা ওয়েলফেয়ার আসোসিয়েশন কর্তৃক বিভিন্ন কর্মশালা আয়োজিত হয়। অরণ্যকে রক্ষা করতে এই সংস্থা বদ্ধপরিকর। এর tagline হল- 'বিশ্বকে বাঁচাতে অরণ্য থাকুক মাথাতে'।

৬) **এক-চালা এবং দো-চালা মন্দির**: বাংলার খড়ো চালের মাটির ঘরের আদলে তৈরী এক শ্রেণীর মন্দিরকে বলা হয় এক-চালা মন্দির। এই শৈলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল চালাটির বাঁকানো শীর্ষ ও কার্নিস। আর সামনে-পিছনে দুটি ঢালু চাল থাকলে তাকে বলা হয় দো-চালা বা এক বাংলা মন্দির।

৭) **টেরাকোটা**: 'টেরা'/Terra (মাটি) আর 'কোটা'/Cocta (পোড়ানো) শব্দ দুটির সমন্বয়ে 'টেরাকোটা' শব্দটি গঠিত হয়েছে, যার উৎস আদতে লাতিন ভাষা (Terracotta)। বাংলায় 'টেরাকোটা' শব্দটির প্রচলন থাকলেও বাংলা ভাষায় একে পোড়ামাটির শিল্প-ও বলা হয়ে থাকে।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ:

১) আমার পিতা স্বর্গীয় নব কুমার চোংদার
২) গ্রামেরই বাসিন্দা ও মানকর কলেজের অধ্যাপক অর্ণব ঘোষ।
৩) রায় পরিবারের যিনি মন্দিরের তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন মাননীয়া শ্রীলেখা রায়।
৪) আমাদের কলেজের সহকর্মী পাপু হাজরা, সন্তু নন্দী ও রামকৃষ্ণ মৈত্র।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. ঘোষ, বিনয়। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। প্রথম খন্ড, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৯, পৃষ্ঠা- ৩৯-৪৪।
২. ঘোষ, শিবশঙ্কর। গোপভূমের সরূপ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৪, পৃষ্ঠা- ২৯৯-৩০৩।
৩. বন্দোপাধ্যায়, দিলীপ কুমার। বাংলার নদ নদী। কলকাতা, দে'জ পাবলিকেশন, ২০১৬, পৃষ্ঠা- ৪৭-৫৪।
৪. ঘোষ, বিনয়। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। প্রথম খন্ড, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৯, পৃষ্ঠা- ৩৯-৪৪।
৫. চট্টোপাধ্যায়, অমর ও পাল, শচীনন্দন। পশ্চিম ও মধ্যরাঢ়ের গ্রামগঞ্জ। রূপনারায়নপুর, পশ্চিম বর্ধমান, যোধন প্রকাশনী, ২০২৩ পৃষ্ঠা- ৭-১১।
৬. মুখোপাধ্যায়, বরুণ। জঙ্গলের কোলে আস্ত আলপনা গ্রাম লবণধার। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ই মে ২০২৫।
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌনক। আলপনা গ্রাম লবণধার। ০১/০৮/২০২৩, অনলাইন থেকে সংগৃহীত।